বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন

সুস্মিতা দত্ত
(সাবেক) গবেষণা সহযোগী, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ
Email: dutta.susmita.p@gmail.com
[রাষ্ট্র-বিনির্মানে সহায়তার উদ্দেশ্যে ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ-এর সীমিত উদ্যোগ। www.ergonline.org]

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এরকম পদ্ধতিতে প্রত্যেকের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে বিচক্ষণতা প্রয়োজন তা গড়ার জন্য চাই বিদ্যা। আর বিদ্যা অর্জনের জন্য চাই সঠিক প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্র যতটুকু ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে চলেছে, বোধ করি অন্য কোন ক্ষেত্রে এতো কাটাছেঁড়া হয়নি। বিদ্যা প্রদান ও গ্রহণ পদ্ধতি থেকে শুরু করে পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রকমফেরের পরিবর্তনসহ প্রায় সবই পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। সময়ের সাথে সবকিছুই পরিবর্তনীয়। তবে, বিগত বছরগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থায় অতি ঘন ঘন যে পরিবর্তনসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন আর সে কারণের বার বার এই ক্ষেত্রে ব্যবচ্ছেদ চলেছে। বর্তমানে আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনের যে গুঞ্জন উঠেছে, সেটার ছোঁয়া শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রয়োজন। পরিবর্তনটি ধীর গতিতে হলেও সমস্যা নেই, তবে, এমন একটি কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন যেটা বর্তমানের ও আগামীদিনের প্রত্যাশিত পরিবর্তন নিজের মধ্যে ধারণ করে বার বার পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, শ্রেণীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করবে।

এই নিবন্ধটিতে শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারাবাহিক পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণসমূহ নিয়ে বিস্তারিত লিখার সুযোগ নেই। তবে, এতোটুকু বলা যায় যে, এই ভূমিক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যারা প্রবেশ করেছে এবং হাল আমলের বিশ্বায়ন এখানকার শিক্ষাব্যবস্থাকে পালটে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি ও বিভিন্ন মতধারার প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই। তারই প্রেক্ষিতে আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রসহ এই ক্ষেত্রেও আমেরিকা, ফিনল্যান্ডের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি ! শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজেকে প্রস্ফুটিত করা। সুতরাং, প্রস্তাবিত কাঠামোতেই যদি নিজস্বতা না থাকে, তাহলে, যারা এই ব্যবস্থায় গড়ে উঠবে তাদেরও নিজস্বতা বুঝতে পারার ও তা প্রকাশ করার সক্ষমতা গড়ে উঠবে না। আমেরিকা, সিঙ্গাপুর না হয়ে আমরা বরং প্রাচীন বাংলার শিক্ষার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান লালন করে বাংলাদেশ হবার চেষ্টা করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যাশা থাকবে, একটি দল গঠন করে যথাযত গবেষণার মাধ্যমে এমন একটি কাঠামো প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন করা হবে যা এই ভূমিখন্ডের মানুষের মানসিকতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ঐতিহ্যের ধারা ও বর্তমান যুগের পরিবর্তনসমূহ মননে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং যা মানুষকে বিকশিত হবার ও দূরদর্শী হবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করবে।

নিম্নে অতিসংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি যেগুলো আমার কাছে পরিবর্তনযোগ্য অথবা পুনরায় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। সেই সাথে কীভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে, তা নিয়ে নিজের মতামতও প্রকাশ করছি।

১. দেশে একবার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়, আবার অন্য সময় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করা হয়। একটা শুরু হচ্ছে ৪ বছর থেকে আর আরেকটা শুরু হচ্ছে ৬ বছর থেকে। বার বার পরিবর্তন না করে, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে কোন বয়স থেকে শিক্ষা প্রদান শুরু করলে বাচ্চারা মানসিক অশান্তি ছাড়া আনন্দের সাথে বিকশিত হবে তার যথোপযুক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় এবং তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য কী এবং এই দুই ধারা কি আদৌ এতো বছরে একীভূত হয়ে গেছে কিনা তা অনুসন্ধানযোগ্য। উভয় ক্ষেত্রেই পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

৩. গুরুকূল ব্যবস্থায় ফিরে যাবার অবকাশ আমাদের নেই। বর্তমানে অবস্থা এতোটাই ভঙ্গুর যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধাহীনতায় ঠেকেছে। এই অবস্থায় ব্যবস্থাপনা গুরুকূলের মতো না হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠদান পদ্ধতি অন্তত সেরকম হতে পারে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, প্রশ্ন করার ক্ষমতা ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই পদ্ধতি ছোটবেলা থেকেই যুক্তি ও জ্ঞানতত্ত্বের প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন ও প্রয়োগ সম্পর্কে সক্ষম করে তুলতে পারে।

৪. পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা ছিলো। সেটা বন্ধ করে পিএসসি পরীক্ষা শুরু করা হলো। এরপর আবার এই পরীক্ষাটি বন্ধ করে দেয়া হলো। বার বার পরীক্ষা নেবার পদ্ধতি/ধারা পরিবর্তন কোনভাবেই কাম্য নয়। সেজন্য পরীক্ষার নেবার উদ্দেশ্য কী তা প্রথমে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এক শ্রেণীতে কৃতকার্য হয়ে শুধু অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াই কি পরীক্ষার উদ্দেশ্য? নাকি কোন এক শ্রেণীতে যা শিখলাম, তা প্রয়োগ করা সামর্থ্য হয়েছে কিনা তা যাচাই করা উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ণয় করা যেতে পারে। এটা শুধু প্রাথমিকের ক্ষেত্রে নয় বরং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পিএসসি ও জে এস সি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সেটাও অনুসন্ধানযোগ্য।

৫. চলে আসি উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যাপারে। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই করে থাকেন। দশম শ্রেণীতে এস এস সি পরীক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করেন অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। অর্থাৎ একটা দরজা যখন পেরুতে হচ্ছে, তখন আর নিজের বিদ্যালয়ের শিক্ষকের উপর পুরোপুরি ভরসা করা হচ্ছে না! প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু এস এস সি বা এইচ এস সি'র ক্ষেত্রে এরকম কেন হচ্ছে? কোন মূল্যায়ন পদ্ধতি কী কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তা কতটুকু ফলপ্রসূ তা অনুসন্ধান করে পরিবর্তন বা রেখে দেয়া প্রয়োজন।

৬. এস এস সি ও এইচ এস সি এর দরজাদ্বয় সম্ভবত চাকরি প্রার্থী হবার সাথে সংযুক্ত। এক্ষেত্রে, যদি নিয়োগকর্তারা বলেন, এই দুই সনদের প্রয়োজন নেই, তাহলে পরীক্ষা দু'টোও গুরত্ব হারাবে। সনদ বা ডিগ্রি কি চাকরি পাবার টুল হিসেবে ব্যবহার করা হবে নাকি শিক্ষা তার নিজস্বতায় চলবে, তা যদি নির্ধারণ করা না হয়, বার বার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঠেকানো যাবে না। আমি কোন কিছু চিরস্থায়ী করতে বলছি না। শুধু বলছি, এমন একটা কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরী যা ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতা তৈরি করবে না বরং একটা নির্দিষ্ট গতি বজায় রেখে চলতে থাকবে / পরিবর্তিত হবে।

৭. কিছুদিন আগে এক পরিচিতজন একটি ভিডিও পাঠালেন। বিষয়বস্তু ছিলো, সঞ্চালক তার অতিথিকে প্রশ্ন করছেন শ্রেণীকক্ষে পড়ার বিষয় সম্পর্কে। অতিথি উত্তর দিচ্ছেন, এই যে ছোটবেলা থেকে

$a^2 + b^2 = c^2$ পড়েছি, সেটা জীবনে কী কাজে লেগেছে? একই দৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। অনার্স পড়াকালীন সময়ে আমাদের এক ব্যাচমেট স্যারকে প্রশ্ন করেই বসলো, স্যার, এগুলো পড়ে কী হবে? কোন কিছুই তো চলার পথে কাজে লাগছে না আর কাজে লাগবে বলেও মনে হচ্ছে না। কথাগুলো সত্য। এক্ষেত্রে দুইটা সমস্যা আছেঃ ক। যেসব তত্ত্ব পড়ানো হয়, সেগুলোর বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপস্থাপন করা হয় না এবং খ। এমন কিছু বিষয় পড়ানো হয় যেগুলো হয়তো সময়ের পরিবর্তনে নতুন তথ্য ও তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। এটা বোধগম্য যে সবার সবক্ষেত্রে পাঠ্যগুলো কাজে আসবে না। হয়তো কয়েকজন তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক কাজে যুক্ত হলে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

৮. কে কোন বিষয়গুলো পড়বে? এই পয়েন্টে আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বাদ রেখে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সিলেবাস নিয়ে বলছি। আমরা যা পড়ি, তার সব কিছু জীবনে চলার ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রয়োজন হয় না। আবার ভবিষ্যতে কার কোন দিকে আগ্রহ জাগ্রত হবে তাও বুঝার উপায় নেই। সেজন্য সিলেবাস প্রণয়নের সময় দুটো বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন, (ক) প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এবং (খ) ভবিষ্যতে আগ্রহী হলে যাতে এর ক্ষাণিক অংশ মস্তিষ্কে থেকে যায়। আবার প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনার বিষয়ের যাতে ধারাবাহিকতা থাকে, তাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে কয়েকটা ধারাতেও ভাগ করে নেয়া যেতে পারে। আবার কয়েক ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাগ করে একেকটা ধারা দিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে প্রথমে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক গবেষণা করে নেয়া দরকার বলে মনে করি।

৯. এবার আসি উচ্চ শিক্ষার কথায়। গত কয়েক বছরে যে পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে, তার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। এছাড়া কতটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষায়িত হবে তাও বিবেচনায় নেয়া দরকার। বর্তমান সময়ে বৈশ্বিকভাবে চাকরিক্ষেত্রে ডিগ্রির রিকোয়ারমেন্ট পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, ডিগ্রিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এটি অবশ্য শিক্ষার খরচের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। এগিয়ে থাকতে চাইলে আমাদের ভাবতে হবে, ডিগ্রির উদ্দেশ্য কি চাকরি পাওয়া নাকি শুধু জ্ঞান উৎপাদন করা? উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যকে আমি মূলত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য দূরদর্শী মানুষ তৈরি করাকে বুঝি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের মত পার্থক্য আছে। আবার মানষের জীবনে অর্থের যে অসীম গুরুত্ব আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের আর্থিক দিকে ভারসাম্য রেখে বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যার সমাধান দেবেন এমন মানুষ তৈরির কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। আমরা কি আমেরিকাকে অনুসরণ করবো নাকি নালন্দার দিকে ফিরে তাকাবো নাকি দু'টো মিলিয়ে যুগোপযোগী কিছু তৈরি করবো তা শুধু গভীরভাবে বিশ্লেষণের পরেই বলা যাবে।

১০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসাশনিক কাঠামোতেও পরিবর্তন আবশ্যক। কীসের মাধ্যমে পাঠদান করা হবে তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এমন অনেক বিষয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা আছে যা

শিক্ষার্থীরা আপাতদৃষ্টিতে শুধু ইন্টারনেটের খরচ দিয়েই শিখে নিতে পারছে। সুতরাং, সরাসরি কীভাবে এবং কী পাঠদান করা হবে, যার জন্য শিক্ষার্থীরা সশরীরে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হবে তা ভেবে দেখতে হবে।

১১. আরেকটি ব্যাপার আলোচনায় আসা জরুরী। স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করতে করতে আমাদের বয়স এসে দাঁড়ায় ছাব্বিশ, সাতাশে। আর চাকুরিতে প্রবেশ করতে করতে সেটা হয়ে যায় ত্রিশ। প্রায় অর্ধেক জীবনই চলে যায় প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনাতে। এরপর যখন আমাদের খেয়াল হয় আমরা আসলে বাস্তবভিত্তিক তেমন কিছুই শিখিনি তখন ফেলে আসা সবগুলো বছরই অর্থহীন মনে হয়। সুতরাং, আমাদের এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন যা জীবনকে এবং নিজেকে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকরূপে সম্পন্ন করে তুলবে।

সীমিত পরিসরে ইতি টানার জন্য নিবন্ধটি যদিও ১১ টি পয়েন্টে সীমাবদ্ধ রাখছি, এগুলোর মধ্যেই আরো অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। একেকটি দিকের বিস্তারিত এবং সবদিক মিলিয়ে বিশ্লেষণ করে সার্বিক একটি কাঠামো তৈরি করা হলে আশা করছি, শিক্ষাক্ষেত্রে উপর্যুপরি ব্যবচ্ছেদ হ্রাস পাবে এবং দেশের স্বার্থে বিচক্ষণ মানুষ তৈরি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে জোরদার করা যাবে। সর্বোপরি, সীমিত সুযোগ বা সম্পদের কারণে শিক্ষা ও জীবন-জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তৈরি হলেও পরিবেশ হোক সহযোগিতাপূর্ণ।